রবীন্দ্রমানসের মানসীরা

- সুদীপ্তা রায়চৌধুরী

"প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে / জানে সে তারে তোমার গানে / আপন চেতনায়" । তাঁর প্রিয়ার যে ছায়া বর্ষা মেঘের আকাশে ক্ষণে ক্ষণে ওঠে ভেসে, যে প্রিয়ার "আঁচল দোলে নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে" -- তারই পরিপূর্ণ অবয়ব গড়ে তোলার লোভ সম্বরণ করাটা রবীন্দ্র অনুরাগীদের পক্ষে বেশ শক্ত । রবীন্দ্র অনুরাগীদের অন্যতম একজন হয়ে সেই কবি মানসীকে অল্প অল্প করে মূর্ত্ত করার প্রয়াসে আমি মেঘমালা ।

জল খেয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেয় মেঘমালা । ২২শে শ্রাবণ উপলক্ষে রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত আজকের এই আলোচনা-সভার বিষয়বস্তু হল "নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা"-- যাতে আলোচিত হবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, পূজারী রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ, গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি । এমন একটা সভায় নানান প্রাজ্ঞজনের মধ্যে মেঘমালাকে নিতান্তই অর্বাচীন ভাবাটা অন্যায় নয়, তবুও সে আমন্ত্রণ পায় নবাগতা সাহিত্যিক হিসাবে । দক্ষিণ কলকাতায় বড় হয়ে ওঠা মেঘমালার প্রথম বন্ধু ছিল "সঞ্চয়িতা" -- বাবা দিয়েছিলেন । বলেছিলেন, "দেখো, সারা জীবন তোমার বন্ধু হয়ে থাকবে ।" কি আশ্চর্য্য ! তারপর থেকে অল্প অল্প করে ঢুকে পড়ে রবীন্দ্রচর্চার জগতে । নিজের অজান্তেই সুচরিতা বা লাবণ্যর আদলেই তৈরী হয়ে যায় মেঘমালার ব্যক্তিত্ব । পড়ার টেবিলের সামনে রাখা রবীন্দ্রনাথের সেই বিশাল ছবির সেই বক্ষবিদারণ দৃষ্টি মেঘমালার ভয়ঙ্কর এক দুর্বলতা । সেই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কতবার বলেছে সে "বৃষ্টিভেজা যে ফুলহার / শ্রাবণ সাঁঝে তব প্রিয়ার / বেনীটি ছিল ঘেরি, / গন্ধ তারি স্বপ্নসম / লাগিছে মনে, যেন সে মম / বিগত জনমেরই ।"

উন্মুখ শ্রোতাদের সামনে মেঘমালা বলে চলে -- রবীন্দ্রকাব্যে নারীরা বার বার এসেছে অসাধারণ মনন শক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্যের অধিকারিনী হয়ে । সেই মানসীর গলায় আত্মপ্রত্যয়ের সুর – "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার / কেন নাহি দিবে অধিকার / হে বিধাতা, নত করি মাথা / পথপ্রান্তে কেন রব জাগি / ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশা পূরণের লাগি / দৈবাগত দিনে ? / শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? / কেন নিজে নাহি লব চিনে সার্থকের পথ ?" হয়তো কবির অভিপ্রেত ছিল যে সেই মানসী প্রতিমা বলুক, "যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণি -- / আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী / বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন, / সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন ক্ষীণদীপ্তি গোধুলিতে ?" সেই একই আত্মপ্রত্যয়ের সুর শোনা যায় চিত্রাঙ্গদার কন্ঠে – "নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী, / পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্দ্ধে সে নহি নহি, / হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি / যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে / সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে / পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে ।" "পলাতকা" কাব্যগ্রন্থের মুক্তি কবিতার সেই নারী -- যার জীবন মানেই বিড়ম্বনা, তারও উপলব্ধি হল – "আমি নারী, আমি মহীয়সী, / আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী, / আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা, / মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা ।"

"শেষের কবিতায়" "অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমা রাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত । --- ড্রইং রুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দেয়না । লাবণ্যকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয়, সে সঙ্গে আছে মননের শক্তি । -- আর এইটেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে । লাবণ্যর মুখে অমিত এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যা ওর শান্ত হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল ।"

"গোরা" উপন্যাসের গোরা "শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য, যে প্রগলভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখভঙ্গিতে তার আভাসমাত্র কোথায় ! তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহে প্রকাশিত, কিন্তু নম্রতা আর লজ্জার দ্বারা কি সুন্দর কি কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে । -- ভ্রুযুগলের উপর ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ ।" গোরার অনুভূতিতে -- ভারতের নারী প্রকৃতি সুচরিতা মূর্ত্তিতে তার সামনে প্রকাশিত । "ভারতের গৃহকে পুণ্যে সৌন্দর্যে ও প্রেমে মধুর ও পবিত্র করার জন্যই ইঁহার আবির্ভাব । গোরার কাছে নারী যখন অত্যন্ত ছায়াময় ছিল তখন দেশ সম্বন্ধে তাহার যে কর্তব্যবোধ ছিল তাহাতে কি একটা অভাব ছিল । যেন শক্তি ছিল কিন্তু প্রাণ ছিলনা । যেন পেশী ছিল কিন্তু স্নায়ু ছিলনা ।" সুচরিতার সান্নিধ্যে এসে গোরা উপলব্ধি করে যে "নারীকে আমরা যতই দূর করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া জানিয়াছি, আমাদের পৌরুষও ততই শীর্ণ হইয়া মরিয়াছে ।" -- তারপর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে গোরা ও সুচরিতা দুজনেরই দেশাত্মবোধ, ধর্ম ও জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে উপলব্ধি পায় পরিপূর্ণতার রূপ ।

"শাপমোচন" গীতিনাট্যে কুশ্রী-দর্শন অরুণেশ্বরকে ত্যাগ করে ফিরে এসেছিল কমলিকা; তারপর দীর্ঘ বিচ্ছেদে বিরহের দাবদাহে বিদগ্ধ কমলিকার হৃদয় যখন সেই অসুন্দরের মধ্যেই খুঁজে পায় সুন্দরকে, তখন তার প্রেম পায় পূর্ণতা । নাটকের শেষ দৃশ্যে হাতের প্রদীপের আলোয় অরুণেশ্বরকে অবলোকন করে কমলিকা অস্ফুটে বলে ওঠে "প্রিয় আমার, প্রভু আমার, একি অপরূপ রূপ তোমার !" শাপমোচনের গল্পই হল অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে খুঁজে পাওয়া অর্থাৎ বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে অন্তরের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি । এক্ষেত্রে পাঠকগণের মনে হতেই পারে অরুণেশ্বরের অন্তরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার জন্য কমলিকার প্রদীপের আলোর কি দরকার ছিল ? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গানেরও উল্লেখ করা যেতে পারে – "চোখের আলোয়

দেখেছিলেম চোখের বাহিরে। অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহি রে।" তবে কি কবি শুধু নাটকের প্রয়োজনেই প্রদীপখানি ব্যবহার করেছিলেন ? আমরা ভেবে নিতেই পারি যে এই প্রদীপের আলো কমলিকার পূর্ণতাপ্রাপ্ত প্রেমের বিচ্ছুরিত আলোর রূপক -- যা অরুণেশ্বরের বাহ্যিক রূপকে ছাড়িয়ে তার অরূপকে দীপ্তিমান ও দৃশ্যমান করেছিল।

"রক্তকরবীর" অধ্যাপক চারপাশের হাটের মধ্যে নন্দিনীকে দেখেছিল যেন সুর বাঁধা তম্বুরা। ঈশানীপাড়ার নন্দিনী যক্ষপুরীতে এসে দেখেছিল এর চারপাশে কেবল ভাঙা মানুষ আর টুকরো মানুষের ভিড়, যারা কেবল রাগ করছে, সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে। নিজের সহজ ব্যক্তিত্বে তার মনে হয়েছিল এদের সবার দিকেই বাড়িয়ে দেওয়া যায় বন্ধুতার হাত। কুঁদফুলের মালা তাই এগিয়ে দিয়েছিল রাজার দিকেও। তারপর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সে বুঝতে পারে যে সকলের দিকেই নিজেকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভালোবাসার জন্যেই দাঁড়াতে হয় কারো কারো বিরুদ্ধেও। তাই যখন সে বলে ওঠে – "রাজা এইবার সময় হল --- আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই" -- তখনই পরিপূর্ণতা ঘটে তার ব্যক্তিত্বের।

ভালোবাসার সমস্যা নিয়ে তৈরী হয়েছিল "যোগাযোগ" উপন্যাস। একদিকে মধুসূদনের ক্লিন্ন আবেষ্ঠন, আর অন্যদিকে সেই সঙ্কীর্ণ আবেষ্ঠন থেকে বেরিয়ে আসার তাড়না কুমুদিনীর এবং ঘটনার গুরুতর মুহূর্তগুলিতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে সুর। বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গেছে যখন, কুমু তখন তার এস্‌রাজ নিয়ে বাজায় ভুপালির সুর, দাদার সঙ্গে বিচ্ছেদের দিনগুলিতে বাজায় কানাড়া - মালকোষের আলাপ, স্বামীর সাথে বোঝাপড়ার রাতগুলিতে তাকে আওড়াতে হয় দাদার কাছে শেখা মীরাবাঈএর গান, অলঙ্কার যৌতুক নিয়ে আসা মধুসূদনের সামনে সুর বাঁধে, কেদারা থেকে পৌঁছে যায় ছায়ানটে, যে সুর শুনে মধুসূদনের মতো গানহীন মানুষের মনেও আসে বিহ্বলতা। কুমুদিনী যখনই বাজায় বা গায়, তার মনে হয় সমস্ত জীবন যেন ভরে গেল এক আলোয়, সেখানে সাংসারিক দুঃখ-অপমানের কোন জায়গা নেই। সমস্ত সঙ্কট মুহূর্তে সুরের মধ্যে যেন তার ত্রাণ মেলে। কুমুদিনীর দুঃখ এই জন্য নয় যে সে ভালোবাসা পেল না, বরং এইজন্যেই যে সে ভালোবাসতেই পারলো না। তার প্রেম পৌঁছোতে চেয়েছিল পূজায় আর পূজা চেয়েছিল প্রেমে পৌঁছোতে। মাঝখানে সেতু ছিল গান আর সুর। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। তাই মোতির মাকে একদিন কুমু তার সমস্ত আবেগ দিয়ে বলেছিল, "আজ দেখতে পাচ্ছি ভালোবাসতে পারাটাই সবচেয়ে দুর্লভ, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় ঘটে।"

যে সেতুটি কুমুদিনী তৈরি করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি, তারই আয়োজন নিয়ে ভরে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান, পূজার গান, গীতবিতানের পর্যায় ভাগ অনুযায়ী মাঝে মাঝে সেগুলিকে আলাদা করা কঠিন হয় পড়ে। "মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে, / মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে, / প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো, / হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে, / তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে" -- একি পূজা ? হয়তো তাই। একি প্রেম ? হয়তো তাও।

সাম্প্রতিক কালের থেকে অনেকখানি এগিয়ে কবি যে নারীমূর্তি কল্পনা করেছিলেন, তাঁর সার্ধশতবর্ষের দোরগোড়ায় এসেও সেই কল্পনার বাস্তবায়িত রূপ সমাজের সকল স্তরে বড় একটা চোখে পড়েনা। কবিসৃষ্ট এই নারীমূর্তি হল সেই-ই – "আঙিনায় যে আছে অপেক্ষা করে। তার পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর", খুবই নম্র তার ভূমিকা -- "আমার এ ঘর বহু যতন করে / ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে / আমারে যে জাগতে হবে / কি জানি সে আসবে কবে --- ।"

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে মেঘমালার আবেগাপ্লুত গলা ধরে এসেছিল। চলতে লাগল পরবর্তী বক্তাদের বক্তব্য পেশ করা। একটা অদ্ভুত ভালোলাগায় আবিষ্ট হয়ে বসে রইল মেঘমালা, -- টুকরো টুকরো কথা কানে ভেসে আসতে লাগল – "রবীন্দ্রনাথের গান নিজেকে রচনা করে তোলবার গান। এ এক বিরামহীন আত্মজাগরণের আত্মদীক্ষার গান। দীক্ষার এই বেদী থেকে প্রতিদিনের আত্মচরিতের দিকে তাকিয়ে দেখি -- দেখি এমন কোন পদ্ম গড়ে ওঠেনি আমার স্বভাবের মধ্যে যেখানে এসে পা রাখবেন শ্রী, সৌন্দর্য" --- ইত্যাদি।

সাহিত্যসভার শেষে সভাগৃহ ছেড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে মেঘমালা রবীন্দ্রসদনের বাঁধানো রাস্তা ধরে। বেশ ক্লান্ত লাগছে। বিকেল পেরিয়ে গেলেও আলোটুকু রয়ে গেছে এখনও। রাস্তার ধারের দেবদারু গাছগুলিতে হালকা হাওয়ার ছোঁওয়া। দৃষ্টি চলে যায় সামনের চাতালে বসে থাকা অনেক মানুষের মধ্যে। ভেসে আসছে মিষ্টি খোলা গলার গান – "মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে / মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে / প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো" -- কোন প্রেমিক বন্ধুর সান্নিধ্যে বসে তার বান্ধবী তার সমস্ত হৃদয় উজাড় করে গাইছে। বিকেলের নরম আলোর প্রেক্ষাপটে এই সুন্দর ছবিটি মনের মধ্যে একেবারে নাড়া দিয়ে গেল। হৃদয়ের বাষ্পাচ্ছ্বাসে গলার কাছে একটা হাল্কা ব্যথার অনুভূতি, মন কেমন করতে থাকে মেঘমালার -- তার নিজের সেই একান্ত আপন প্রবাসী বন্ধুটির জন্য মনের মধ্যে বেজে চলে সুর, "আজি গোধুলি লগনে এই বাদল গগনে / তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গনি।" এবার বুঝি চোখের কোণ ছাপিয়ে শুরু হবে প্লাবন। মেঘমালা মনে মনে না বলে পারল না যে – "কবি তুমি আরও শত শত বছর ধরে আমাদের মাঝে থেকো, থেকো জীবনের নিবিড়তম মুহূর্তগুলিতে -- কথা ও সুরের ভাণ্ডার নিয়ে।" ❑